বাংলাদেশ ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র

বৃহৎ পুঁজির ভাব কিংবা কাঁটাতারের বন্ধুত্ব

আনু মুহাম্মদ

Reality is not destiny; it is a challenge.
We are not doomed to accept as it is.
- Eduardo Galeano

বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত। বাংলাদেশের ভেতরেও ভারত আছে নানাভাবে। ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তবে দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তি কী, পুঁজির বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান কী রূপ নিচ্ছে তা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। বৃহৎ পুঁজির ভাব আর সর্বজনের স্বার্থ এক নয়। নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক সফরকালে মিডিয়ার অভিন্ন সুর দিয়ে ভারতকেন্দ্রিক বৃহৎ পুঁজির সম্প্রসারণের পক্ষে জনসম্মতি নির্মাণের প্রক্রিয়া খুবই দৃষ্টিকটু মাত্রা নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং বিভিন্ন চুক্তির আড়ালে দক্ষিণ এশিয়ার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তুতি বিষয়ে বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য। এর বিপরীতে এ অঞ্চলের জনগণের সংহতি ক্ষেত্রগুলোর দিকেও প্রবন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

গত ৫ জুন নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের ঘটনা বাংলাদেশে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে থেকে মিডিয়া অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস তৈরি করেছে। সরকার, অঘোষিত প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, বিশেষজ্ঞ, সুধীসমাজসহ বিভিন্ন মহল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। যা কিছু ভারতের চাহিদা সেগুলোই প্রচারিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে, বাংলাদেশের অর্জন বা সাফল্য হিসেবে। জনসম্মতি নির্মাণের কর্মসূচি (পিআর) যে খুবই দক্ষভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের গত সাধারণ নির্বাচনের সময় বিজেপির প্রবীণ নেতা এল কে আদভানি মোদির প্রশংসা করে তাঁকে খুবই সফল 'ইভেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ঠিকই, নরেন্দ্র মোদি বিজেপির শত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অভিযোগ আড়াল করে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ভারতে একদিকে তিনি আগ্রাসী 'উন্নয়ন' ধারার হিংস্রতা ঢেকেছেন হিন্দুত্ববাদী-জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা দিয়ে। আবার অন্যদিকে 'উন্নয়ন' ঢাক পিটিয়ে নিজেদের সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার ইতিহাস আড়াল করতে সক্ষম হয়েছেন। আগে থেকেই রিলায়েন্স-আদানিসহ ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা একযোগে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে তো বটেই, বাংলাদেশেও তিনি এদের দায় মিটিয়ে গেছেন।

ভারতে একদিকে তিনি আগ্রাসী 'উন্নয়ন' ধারার হিংস্রতা ঢেকেছেন হিন্দুত্ববাদী-জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা দিয়ে। আবার অন্যদিকে 'উন্নয়ন' ঢাক পিটিয়ে নিজেদের সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার ইতিহাস আড়াল করতে সক্ষম হয়েছেন।

গত এক দশকে নরেন্দ্র মোদির সাফল্যের তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। বাংলাদেশ সফরের পর সেই তালিকা আরো দীর্ঘ হলো। বাংলাদেশে তিনি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দেশের মধ্য দিয়ে রেল, সড়ক, নৌ–সকল পথে নিজের দেশের এক প্রান্তের সাথে অন্য প্রান্তের কানেক্টিভিটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার, শত আর সহস্র নাগরিক-বুদ্ধিজীবী, এবং মিডিয়ার উচ্ছ্বাসে এসবই বাংলাদেশের অর্জন বলে অভিহিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ফেরার পর মনমোহন সিং সঠিকভাবেই বলেছেন, 'মোদি একজন ভালো সেলসম্যান।'

প্রধানমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগে আগে বহু বছরের স্থলসীমান্ত নিয়ে সমস্যার অবসানে ভারত সংসদীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'পক্ষের জন্যই এই সিদ্ধান্ত স্বস্তিকর। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় থেকে কয়েক হাজার একর জমি নিয়ে এই বিরোধ জিইয়ে ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পর বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ভারত এত দিন এটা আটকে রেখেছিল। এর জন্য দু'দেশের ছিটমহলে আটকে থাকা দুই দেশের মানুষদের অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে যেতে হয়েছে এত বছর। ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এসংক্রান্ত বিল পাস হবার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হলো যে, ইচ্ছা করলে সহজ কাজ কত সহজে করা সম্ভব! ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে বাংলাদেশে উচ্ছ্বাস তৈরির জন্য এই চুক্তি খুব ভালো বিষয় ছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য আড়ম্বরপূর্ণ সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। উচ্ছ্বাসের মধ্যে হারিয়ে যায় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়। আলোচনা, প্রশ্ন, ক্ষোভ–সব ধামাচাপা পড়ে যায়। শোনা যাচ্ছে, এই সীমান্ত চুক্তির ফলে কাঁটাতারের বেড়া যেখানে অসমাপ্ত আছে, তা সমাপ্ত করার পথ সুগম হবে।

এই সফরকালে, উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি, ভারতের সঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে জনসমাজে নানা প্রশ্ন এবং ক্ষোভ আছে, সেগুলো নিয়ে ঢাকা শহরে আলোচনা, সমাবেশ হয়েছে। নদী, সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প, সীমান্ত হত্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের ভূমিকার পর্যালোচনা এবং প্রতিবাদও হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর খবর সে সময়ের পত্রপত্রিকা বা টিভি দেখে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, প্রচারপত্র বিতরণ করায় সফরের আগে ও সময়কালে

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, বাসদ ও বাম মোর্চার নেতাকর্মীদের আটক করা হয়েছে, রিমান্ডে নেওয়াসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। সেগুলোর খবরাখবরও আসেনি মিডিয়ায়।

মোদির সফরকালের সময়ে মিডিয়ার ভূমিকা থেকে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় বাংলাদেশের সরকার বা কোনো নাগরিকের সন্তুষ্ট থাকার অধিকার আছে, কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার দেশের নাগরিকদের দেওয়া যাবে না। নরেন্দ্র মোদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী মনে করার অধিকার থাকবে, কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় তাঁর ভূমিকা, তাঁর দলের আগ্রাসী ধর্মান্ধ অবস্থান মনে করিয়ে দেবার অধিকার থাকবে না কারো। সম্মানজনক সমমর্যাদাভিত্তিক বন্ধুত্বের দাবি তোলার অধিকার যে বাংলাদেশের নাগরিকদের আছে, তা মিডিয়া দেখে মনে হয়নি।

বর্তমান প্রবন্ধে ধামা দিয়ে চাপা দেওয়া বিষয়গুলো সামনে এনে বৃহত্তর পটভূমিতে দক্ষিণ এশিয়ার গতিপথ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নিজ বলয় সম্প্রসারণে ভারতের একচেটিয়া কর্মকৌশল, পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে ও তার বাইরে চীনের নানামুখী তৎপরতায় এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গতিমুখ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কি ভেসে যাবে, নাকি দাঁড়ানোর মতো রাজনৈতিক দিশা খুঁজে নিতে পারবে সেটাই অদূর ভবিষ্যতে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে।

'নতুন প্রজন্ম নয়ি দিশা'

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে ৬৫ দফা ঘোষণার শিরোনাম এভাবেই করা হয়েছে: 'নতুন প্রজন্ম নয়ি দিশা'। এই ঘোষণায় যেসব চুক্তি ও সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও বাণিজ্য, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দুই বিলিয়ন ডলার ঋণ, বঙ্গোপসাগর অর্থনীতি, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভারতকে সাবমেরিন কেবল ইজারা দান, বাংলাদেশে ভারতের বীমা কোম্পানির কার্যক্রম অনুমোদন। এছাড়া বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের যাত্রী ও পণ্যবাহী যান চলাচল পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ না থাকলেও ১৫ জুন থিম্পুতে চারদেশীয় চলাচলের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে।[১] এছাড়া এই সফরকালেই ভারতের কুখ্যাত আম্বানি ও আদানি গ্রুপের সাথে বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ চুক্তির প্রাথমিক বোঝাপড়া নিশ্চিত হয়, যৌথ ঘোষণায় সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হবার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

এসব চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রেল, সড়ক, সমুদ্রবন্দর-সবকিছুর ওপর ভারতের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হলেও বাংলাদেশের জনগণ তো দূরের কথা, তথাকথিত সংসদ সদস্যরাও এর বিস্তারিত জানেন না। এতে বাংলাদেশের কী লাভ কী ক্ষতি তা নিয়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা, স্বচ্ছতা– সর্বোপরি জনসম্মতি ছাড়াই সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে তিস্তা চুক্তি নিয়ে শোরগোল এমন তৈরি করা হয়েছে যে, মনে হয় ভারত রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের আর কিছু চাইবার নেই। অথচ তিস্তা চুক্তি বলতে কী বোঝায়, চুক্তি স্বাক্ষর হলেই তা বাংলাদেশের পক্ষে যায় কি না, সে বিষয়ে মিডিয়ারও মনোযোগ খুবই কম। অভিন্ন সকল নদীর ওপর বাংলাদেশের অধিকার নিষ্পত্তির কোনো উদ্যোগ নেই। কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে আছে বাংলাদেশ।

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ ঘোষণায় বাংলাদেশের জনগণের উদ্বেগ আর স্বার্থের বিষয়গুলো, যেমন–আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদীর ওপর বাংলাদেশের অধিকার, ওদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সীমান্ত হত্যা বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে মৌখিক বাগাড়ম্বরের বেশি কিছু পাওয়া যায়নি। কাঁটাতারের বেড়া অপসারণ আলোচ্যসূচিতেই ছিল না। সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রীই এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রিলায়েন্স-আদানির সাথে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে বিধিবহির্ভূত পথে কাজ এগিয়ে নেবার শর্তে। এখানে ব্যবহৃত হবে দায়মুক্তি আইন। অর্থাৎ কোনো অনিয়ম নিয়ে আদালতে যাবার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকদের থাকবে না। বাংলাদেশকে দুই বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদেরই ট্রানজিট সড়ক-রেলপথ তৈরি করতে। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এর মাধ্যমে সেখানে ৫০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কারণ এই ঋণে অবকাঠামো উন্নয়নে ভারত থেকেই সর্বোচ্চসংখ্যক উপকরণ, বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠান নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এর সঙ্গে কোনো শর্ত নেই। এই দাবি শতভাগ ভুল। সবকিছু মিলিয়ে মোদি সফল, তাঁর সব এজেন্ডাই বাস্তবায়িত হয়েছে। শেখ হাসিনা সফল, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে ভারতের নতুন সরকারের সাথে সম্পর্কের শক্ত ভিত তাঁর দরকার ছিল। খালেদা জিয়া সফল, ক্ষমতার রাজনীতিতে বিজেপির সাথে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন দরকার ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার নিজের কী পথ তৈরি করছে, এদেশের মানুষের জন্য কী ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে?

ভারতের ভেতরে বহুজাতি-বহুধর্মের বাস, বিভিন্ন শ্রেণি ও বর্ণে বিভক্ত মানুষ বৈষম্যপীড়িত। রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির নানা নীতি ও ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-লড়াই বহু অঞ্চলে বহুভাবে চলছে, কোথাও কোথাও সশস্ত্র লড়াইও চলছে বহু দশক ধরে।

ভারতকে দেখার বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতির গতিমুখ নির্মাণে ভারতের ভূমিকা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির গতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারক। এতটা গুরুত্ব থাকলেও ভারত নিয়ে বাংলাদেশে নির্মোহ আলোচনা-বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। এদেশে ধর্ম ও সেনাবাহিনী নিয়ে কোনো পরিণত আলোচনা-পর্যালোচনা যেমন অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ বা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে অনুমোদিত, এর কাছাকাছি অবস্থা ভারত নিয়ে যথাযথ পর্যালোচনারও।

সমাজে দুটো প্রধান চিন্তার ধারা ভারত নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পথে বাধা সৃষ্টি করে। একদল ভারতকে সময়-শাসক-দল-মতাদর্শ-নির্বিশেষে বন্ধু বিবেচনা করে, অন্য দল ভারতকে সময়-শাসক-দল-মতাদর্শ-নির্বিশেষে শত্রু বিবেচনা করে। এ দুই দলই যুক্তিতর্কের বাইরে এক কঠিন দেয়ালে নিজেদের চিন্তা আটকে রাখে। বস্তুত 'ভারতের বন্ধু' কিংবা 'ভারতের শত্রু'– এ রকম পরিচয় কোনো অর্থ বহন করে না। কেননা ভারত কোনো একক সমসত্ত্ববিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশ নয়। ভারতের ভেতরে বহুজাতি-বহুধর্মের বাস, বিভিন্ন শ্রেণি ও বর্ণে বিভক্ত মানুষ বৈষম্যপীড়িত। রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির নানা নীতি ও ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-লড়াই বহু অঞ্চলে বহুভাবে চলছে, কোথাও কোথাও সশস্ত্র লড়াইও চলছে বহু দশক ধরে। কেউ যদি

ভারতের শ্রেণিগত, জাতিগত, ধর্মীয়, আঞ্চলিক নিপীড়ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে তাঁকে ভারত রাষ্ট্রের সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে, তা সে ভারত বা অন্য দেশের অধিবাসী যে-ই হোক না কেন।

ভারত সম্পর্কে বলা হয় যে, ভারত হচ্ছে বন্ধুরাষ্ট্র, তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা কখনও বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। 'তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা'– এ রকম কথা বলার মানুষও পাওয়া যায়। ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকার সমালোচনা করলে বাংলাদেশের 'সেক্যুলার' বলে পরিচিত সুশীল সমাজের একটি শক্তিশালী অংশ তাকে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য বলে অভিহিত করে। এদের মিল পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে, যারা ভারতকে দেখে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে, যাদের মতে বাংলাদেশে ভারতের কোনো জনবিরোধী আধিপত্যবাদী তৎপরতা আসলে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর আক্রমণ। খুবই ভুল ধারণা। সেই দেশে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু, কিন্তু তার মধ্যে বহু জাতপাত, বিভেদ, লড়াই-বৈষম্য। ভারত যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হতো এবং রাষ্ট্রের চরিত্র বর্তমানের মতো হতো, তাহলেও বর্তমান সমস্যাগুলো থাকত। বাংলাদেশ হিন্দু রাষ্ট্র হলে কি সমস্যা থাকত না? তাহলে 'হিন্দু রাষ্ট্র' নেপালের সাথে ভারতের সমস্যা হচ্ছে কেন? কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হিন্দু' মানুষ ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার?

আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এই দু'পক্ষের আলোচনার ধরনে মূল প্রশ্নগুলো আড়াল হয়ে যায়। এই অবস্থানের সাথে মিল পাওয়া যায় ভারতের মূলধারার মিডিয়ারও। এসব মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভেতর ভারতবিরোধী ক্ষোভকে 'সাম্প্রদায়িক' 'মৌলবাদী' মুসলিম সমাজের চিন্তার রোগ হিসেবেই চিত্রিত করার চেষ্টা দেখা যায়। এর প্রতিধ্বনি বাংলাদেশ থেকেও শোনা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারত নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষোভ বায়বীয় নয়, বাধা দিলে বা শুনতে না চাইলেই এগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না, এগুলোকে সাম্প্রদায়িক রং দেবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হবে না। এসব ক্ষোভ ও উদ্বেগের পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। বাংলাদেশ ঘিরে ভারতের কাঁটাতার, ফারাক্কার জন্য ক্ষতি, অভিন্ন নদীগুলোর প্রবাহে বাধাদান, সীমান্ত হত্যা, ভারতে বাংলাদেশের পণ্যপ্রবাহে অযৌক্তিক সমস্যা সৃষ্টি, নেপাল ও ভুটানের সাথে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা এবং সর্বশেষ সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প তার অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের কথা এবং বিজেপি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকা ভোলার কোনো সুযোগ নেই আমাদের। তখন বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ভয়ংকর দানবীয় আক্রমণের মধ্যে পতিত হয়েছিল। সে সময় ভারত ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য বড় ভরসা। ভারতেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল। অবশ্য সেই সরকার পরিচালনা খুব সহজ ছিল না। ভারত রাষ্ট্রের অনেক হিসাব-নিকাশের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ওই সরকার অনেক রকম জটিলতায় পড়েছিল।[২] রাষ্ট্রের হিসাব-নিকাশের বাইরে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পাশে ভারতের মানুষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যেভাবে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমরা সব সময়ই তাদের সেই অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। তাদের ভূমিকা রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হয়নি, বর্তমানেও রাষ্ট্রের নানা আধিপত্যবাদী ভূমিকার জন্য ভারতের জনগণ দায়ী নয়।

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পাশে ভারতের মানুষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যেভাবে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমরা সব সময়ই তাদের সেই অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। তাদের ভূমিকা রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হয়নি, বর্তমানেও রাষ্ট্রের নানা আধিপত্যবাদী ভূমিকার জন্য ভারতের জনগণ দায়ী নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বছরে ভারতে ছিল ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। এই সরকার তখন দেশের ভেতর, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী বাম ধারার সাথে যুদ্ধরত। এর কয়েক বছর আগে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালি সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত তরুণরা দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তখন। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ তখন যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের সরকার বনাম জনপ্রিয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই রাজ্যের কংগ্রেস সরকার এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে তখন এক নিষ্ঠুর অধ্যায় তৈরি করেছিল।[৩] জেলজুলুম তো ছিলই বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ইত্যাদি ভয়ংকর মাত্রা নিয়েছিল। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের জন্য বড় এক নিস্তার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল বাঙালিদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রতি সমর্থনও এই কারণে বেড়ে যায়।

২০১৪ সালে একচেটিয়াভাবে বিজয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হলেও ১৯৭১ সালে বিজেপি বলে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। এই দলের ভিত্তি যারা তৈরি করেছে, সেই রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন সবগুলোই ছিল ঘোরতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ভরপুর এবং ধর্মান্ধ। ১৯৫১ সালে চরম সাম্প্রদায়িক নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনসংঘই বিজেপির আদি সংগঠন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারির পর আরো কয়েকটি দলের সঙ্গে জনসংঘ এক হয়ে গঠন করে জনতা পার্টি। ১৯৭৭ সালে তারা ক্ষমতাসীন হয়। তিন বছর পর জনসংঘ ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি গঠন করে। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে তারা মাত্র দুটি আসন লাভ করে। এরপর ক্রমাগত হিন্দুত্ববাদী প্রচারণা, সাম্প্রদায়িক উস্কানিসহ রাম জন্মভূমি আন্দোলন থেকেই তার বিস্তার। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙা এই আন্দোলনের অংশ।[৪] ভারতের 'সেক্যুলার' গোষ্ঠীর ব্যর্থতা বিজেপির ক্ষমতার পথ সুগম করে।

রাজ্য ও কেন্দ্র পর্যায়ে বেশ কয়েকবার ওঠানামার পর ১৯৯৮ সালে মোর্চার মাধ্যমে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়। অটল বিহারি বাজপেয়ি তখন প্রধানমন্ত্রী হন। 'শাইনিং ইন্ডিয়া' প্রচারণায় ভারতের বৃহৎ পুঁজির আস্থা অর্জনের মতো কর্মসূচি নেয় বিজেপি। ২০০২ সালে গুজরাটে নৃশংস সাম্প্রদায়িক গণহত্যার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ব্যাপক কুখ্যাতি লাভ করেন গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, কিশোর বয়স থেকে উগ্র সন্ত্রাসী আরএসএসের একনিষ্ঠ কর্মী, নরেন্দ্র মোদি। সাম্প্রদায়িক ভাবজমিনে সেটাই হয়তো মোদির শক্তিমত্তার প্রদর্শন

হিসেবে স্বীকৃত হয়। গুজরাটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে 'নয়া উদারতাবাদী' বা পুঁজিমুখী মডেলে দৃঢ় অবস্থান মোদিকে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য গড়ে তোলে। এই মডেলের প্রবক্তা মনমোহন সিং হলেও এর বাস্তবায়নে নির্মম আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণের কারণে মোদিকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে থাকে কর্পোরেট মিডিয়া। একপর্যায়ে মহাঘৃণিত ব্যক্তি হয়ে ওঠে ভারতত্রাতা, পুঁজির স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রও তার সমর্থনে মাথা নিচু করে। কংগ্রেস ও বিজেপি শ্রেণিগতভাবে উন্নয়ন দর্শনের দিক থেকে অভিন্ন অবস্থানে থাকলেও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্যও আছে। ভারতজুড়ে শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাম্প্রদায়িকীকরণ, সন্ত্রাসী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সেই সঙ্গে পুঁজিমুখী আগ্রাসী ভূমিকা বিজেপির শাসনকে ভারতের জন্য এক মহাবিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার যুক্তি তুলে এই শাসনকে মহান করে তোলার যুক্তি কী? কী করে তা ভারতের মানুষের প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শন হতে পারে?

ভারত বৃহৎ রাষ্ট্রের রূপ

কোনো রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বা কোনো রাষ্ট্রের শত্রুতা কোনোভাবেই ব্যক্তি মহানুভবতা বা ব্যক্তি বিদ্বেষের বিষয় নয়। ব্যক্তি ব্যক্তির প্রতি মহানুভব হতে পারে, ব্যক্তি উদার হতে পারে, ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক অবস্থান নিতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা শেষ বিচারে নৈর্ব্যক্তিক। সেজন্য রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক। এখানে মহানুভবতা, দয়াদাক্ষিণ্য– এমনকি সম্প্রদায়গত বিবেচনা কাজ করে না। রাষ্ট্র কাজ করে তার অভ্যন্তরীণ শ্রেণিশক্তির বিন্যাস, তার চাহিদা, নীতি ও প্রতিষ্ঠান– সর্বোপরি বিদ্যমান অধিপতি মতাদর্শ অনুযায়ী। অন্যান্য উপাদান এর অধীনস্থ।

ভারত একটি বৃহৎ রাষ্ট্র, আশপাশের সবগুলো দেশের তুলনায় যার অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামরিক শক্তি অনেক গুণ বেশি। ব্রিটিশরা এই অঞ্চল ছেড়ে যাবার পরে অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরে ভারতে যে শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, তার মধ্যে বড় আকারের কোনো ছেদ পড়েনি। আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, সামরিক বাহিনীসহ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রিয়াশীল থেকেছে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকতে পেরেছে। ব্যতিক্রম শুধু ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে দুই বছরের জরুরি অবস্থা। পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সাত বোন' কিংবা কাশ্মীর অঞ্চলগুলোতে সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য 'গণতান্ত্রিক' সরকারই তাদের হত্যার অধিকারসহ নানা অধিকার দিয়ে আইনও জারি রেখেছে। সম্প্রতি এই নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত হচ্ছে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অন্য অঞ্চলগুলোতেও। সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণে, তাদের ইচ্ছামতো মানুষ হত্যার লাইসেন্স দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে যথারীতি 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানের যুক্তি।[৫] 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক' দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এখনো সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশে একসাথে পৃথিবীর বৃহত্তমসংখ্যক দরিদ্রের বাস। মূলধন সংবর্ধনের আদিম ও আধুনিক দুটো রূপই সেখানে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। শাসকশ্রেণির তথাকথিত উন্নয়ন উন্মাদনায় ভারতের বহু কোটি মানুষ এখন উদ্বাস্তু, ছিন্নভিন্ন।[৬]

ভারতের সংবিধানে প্রথম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আছে। বাংলাদেশের মতো এ নিয়ে কাঁটাছেড়া হয়নি, জোড়াতালি দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভারতের সমাজে, রাষ্ট্রীয়ভাবে, বিভিন্ন রাজ্যে, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি আধিপত্যকারী মতাদর্শের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিবাদী উপাদান এখনো প্রবল। বিজেপি ক্ষমতাসীন হবার পর তা আরো শক্তিশালী হয়েছে। সহিংসতার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। আরো উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে যতসংখ্যক অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার, তার চাইতে অনেক বেশিসংখ্যক হিন্দু হিসেবে পরিচিত মানুষ বর্ণপ্রথা নামক স্থায়ী নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার শিকার। নিম্নবর্ণ, হরিজন, দলিত, অচ্ছুৎ বলে কথিত কোটি কোটি মানুষ অবিরাম এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে।

কাজেই নরেন্দ্র মোদি যখন বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে সাথে নিয়ে চলতে চাই', তখন আতঙ্কিত হতে হয়। নিজ দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিপীড়নের শিকার, সেই ভারত তার আশপাশের তুলনামূলক দুর্বল দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

> মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতে সর্বজনের সম্পদ বৃহৎ ব্যক্তিগোষ্ঠী মালিকানায় স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় জোরদারভাবে। তার পরও নবরত্ন বলে পরিচিত নয়টি বড় বড় ক্ষেত্র (তেল, গ্যাস, এনার্জিসহ আরো অন্যান্য খাত) রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হতে থাকে।

ভারতে বৃহৎ পুঁজির ভিত্তি

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার পর জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই ভারত যাত্রা শুরু করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো সেই কাঠামোতেই গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের সরাসরি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থাপন ও বিকাশ ঘটানো হয়। জাতীয় শিল্পের ভিত্তি তৈরি করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের চেষ্টা করা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা, শিক্ষা-চিকিৎসা, ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সত্তরের দশকের মধ্যে ভারত একটি টেকসই শিল্প ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।

উন্নয়নের এই ধারাতেই ভারতে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।[৭] পুঁজির পুঞ্জীভবনের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় ভারত রাষ্ট্র ক্রমে এই একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলোর প্রধান বাহনে পরিণত হয়। শিল্প খাত ও দক্ষ জনশক্তির বিস্তার ঘটে খুবই অসম ও ভারসাম্যহীনভাবে। ভারতের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী যখন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ওপর দখল এনেছে, তখন একই সঙ্গে দুর্বল প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্পে আটকে আছে বিশাল জনগোষ্ঠী। কৃষি খাতের একদিকে যখন বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে, উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার চলে; অন্যদিকে খরা-বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা জেনেটিক প্রযুক্তির আগ্রাসনে বিপর্যস্ত হয় বিপুলসংখ্যক কৃষক।

ভারতের নীতি স্তরে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে কিংবা যে পরিবর্তন অনিবার্য ছিল, তা আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতে সর্বজনের সম্পদ বৃহৎ ব্যক্তিগোষ্ঠী মালিকানায় স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় জোরদারভাবে।

তারপরও নবরত্ন বলে পরিচিত নয়টি বড় বড় ক্ষেত্র (তেল, গ্যাস, এনার্জিসহ আরো অন্যান্য খাত) রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হতে থাকে। এখন পর্যন্ত মাইনিং কিংবা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের ব্যাপারে ভারতীয় সংস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে ৮০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। বিদ্যুৎ খাতের বড় অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। গত কয়েক বছরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর টাটা, রিলায়েন্স, আদানিসহ বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। মোদি সরকারের আমলে এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ভারত যে পুঁজিমুখী বা 'নয়া উদারতাবাদী' সংস্কার শুরু করে, তার প্রধান চালিকাশক্তি তাই সে দেশের বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। এসব সংস্কারের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির ওপর বৃহৎ বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ যেভাবে নির্বিচার আমদানি বৃদ্ধির পথ নিয়েছে, ভারত সে রকম উৎসাহ কখনই দেখায়নি। বরং বাংলাদেশের নির্বিচার আমদানির পথ ভারতের এসব শিল্পগোষ্ঠীর জন্য সুবিধাজনক হয়েছে। ভারতে নতুনভাবে বিন্যস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, বেসরকারি খাত, যৌথ বিনিয়োগ, একক বিদেশি বিনিয়োগ– সব মিলিয়ে ভারতে দেশি বৃহৎ পুঁজি, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, তার সংবর্ধন, পুঞ্জীভবন ও সম্প্রসারণের অনেক বেশি চাপ। এর সাথে খুব সংগতিপূর্ণভাবেই ভারতের সামরিক চিন্তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বড় অংশীদার।

ভারতে কৃষি, বন, নদী, পানি, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক-এডিবি সমর্থিত বিভিন্ন প্রকল্প জনগণের সম্পদ বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের আয়োজন করেছে। এসব প্রকল্প ভারতের মানুষকে ছাপিয়ে এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জন্য ফারাক্কা বাঁধ সব সময়ই একটি মরণফাঁদ, আর এর সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে গজলডোবাসহ আরো অনেক বাঁধ এবং আরো ভয়ংকর আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প। বাংলাদেশ অংশে তিস্তাসহ অনেক নদী এখন মরণাপন্ন। ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ দেবার চীনা পরিকল্পনা ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের জন্যই হুমকি হয়ে উঠেছে। সুন্দরবন ধ্বংস করে হলেও বিশ্বনিন্দিত ভারতের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি এনটিপিসি তার বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বন, নদী, জমি দখল এখন তাদের উন্নয়নের প্রধান ভাষা।

ভারতের মানুষেরা

ভারত প্রসঙ্গে অরুন্ধতী রায় ২০০১ থেকে শুরু করে এই শতকের প্রথম দশকের প্রবণতা সারসংক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, এই দশক *'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবার বিশ্বসভায় অর্থনৈতিক ও পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ভারতের আবির্ভাবকাল। এই বছরগুলো কারো কারো জন্য অভাবনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি এনেছে, অন্যদের জন্য তা এমন দুস্থতা, অনাহার, এমন হতাশা এনেছে যে তাদের জীবনকে আর মনুষ্যজীবন বলা যায় না। গুজরাটের মুসলমানদের জন্য তা এনেছে গণহত্যা। ভারতের মুসলমানদের জন্য তা হিন্দু ফ্যাসিবাদের ভূত। লক্ষাধিক কৃষকের জন্য তা এনেছে আত্মহত্যা। কর্পোরেশনগুলোর জন্য এই সময় দিয়েছে বিপুল মুনাফা। দান্তেওয়াদার আদিবাসীর জন্য এই বছরগুলো এনেছে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ এবং সরকারি নিষ্ঠুর গৃহযুদ্ধ। কাশ্মীর, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মানুষের জন্য তা এনেছে 'স্বাভাবিকতা'র নামে অবিরাম সামরিক দখলদারিত্ব'* (রায়, ২০০৮)।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের বিশাল অঙ্ক বেকারত্বের কোনো সুরাহা দেখাতে সক্ষম হয়নি। অরুন্ধতী রায় ভারত প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য, *'কোটি কোটি মানুষের জমি দখল করে রাষ্ট্র তা 'জনস্বার্থে' তুলে দিচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর হাতে। ২০ বছরের বিশাল প্রবৃদ্ধির পর ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৬০ শতাংশ মানুষকেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে অসংগঠিত খাতে'* (রায়, ২০১২)।

ভারত সরকারের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬০ ভাগের কোনো ল্যাট্রিন নেই, পান করার পানি আনতে গ্রামের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষকে কমপক্ষে আধা কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে হয়। শহরের শতকরা ১১ ভাগ মানুষ বস্তিতে থাকে। আন্ত:রাজ্য পার্থক্য খুবই উচ্চ মাত্রার। কেরালায় যেখানে শতকরা ৯২.৭ ভাগ মানুষ ল্যাট্রিন সুবিধা পায়, ঝাড়খণ্ডে এই সুবিধা পায় শতকরা মাত্র ৭.৫ ভাগ।...গড়ে ভারতের গ্রামের শতকরা মাত্র ২৬.৩ জনের ঘরে প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস আছে, শহরে এই হার শতকরা ৪৭.১ ভাগ (*ফ্রন্টলাইন*, ২০১৪)।

কোটি কোটি মানুষের জমি দখল করে রাষ্ট্র তা 'জনস্বার্থে' তুলে দিচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর হাতে। ২০ বছরের বিশাল প্রবৃদ্ধির পর ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৬০ শতাংশ মানুষকেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে অসংগঠিত খাতে।

কৃষি বিপর্যয়ের কারণে ভারতে প্রতিবছর কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কৃষিতে বৈশ্বিক বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি এবং সরকারের বৈরী নীতির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা যে শুধু অব্যাহত থাকছে তা-ই নয়, কোনো কোনো অঞ্চলে এই হার বেড়েছে। *'গত বছরের তুলনায় এই বছরে মহারাষ্ট্রে আত্মহত্যা বেড়েছে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। শুধু বর্ধমানেই এ বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা উঠেছে ১০৬ জনে। এছাড়া রাজস্থান ও পাঞ্জাব থেকেও আত্মহত্যার নতুন নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে'* (ঘোষ, ২০১৫)।

সর্বশেষ ২০১৪ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স) বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, বিশ্বে ২০০ কোটি মানুষ এখন ক্ষুধার্ত, যার মধ্যে প্রায় ৮১ কোটি মানুষ চরম ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিয়ে জীবন যাপন করে। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াতেই সর্বোচ্চসংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষের বাস। ১২০টি দেশের মধ্যে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা ৩৯, নেপাল ৪৪, ভারত ৫৫ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ৫৭তম অবস্থানে আছে (নিগম, ২০১৫)।

ভারতের প্রবীণ শিক্ষক ও গবেষক উষা পাটনায়েক ভারতের দারিদ্র্য হ্রাসের সরকারি দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে ২০০৪-০৫ এর তুলনায় ২০০৯-১০ এ দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে (পাটনায়েক, ২০১৩)। উষা দশ বছর আগে যা বলেছেন, তা এখনো পরিবর্তন হয়নি, *'ইতোমধ্যে ভারতের মধ্যেই আরেকটি সাব-সাহারান আফ্রিকা তৈরি হয়েছে। ভারতের গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৫০ ভাগ বা ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ সাব-সাহারান আফ্রিকার গড় পরিমাণের চাইতে*

কম খাদ্যশক্তি গ্রহণ করে' (পাটনায়েক, ২০০৫)। দারিদ্র্য নিয়ে তথ্য-উপাত্তের এই ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বাংলাদেশের জন্যও সত্য।

ভূমিগ্রাসী 'উন্নয়ন' পথ

বৃহৎ পুঁজির আত্মসম্প্রসারণের তাগিদ পূরণে ভারত রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী তৎপরতার একটি বড় ক্ষেত্র এখন ভূমি। কৃষকের জমি কিংবা সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে এখনো টিকে থাকা জমি উন্নয়নের নামে ব্যক্তিমালিকানায় অর্থাৎ বৃহৎ কর্পোরেট গ্রুপের হাতে তুলে নেবার জন্য আইন সংস্কার থেকে বল প্রয়োগ– সবই চলছে। কংগ্রেস আমলে ২০১৩ সালে এ বিষয়ক একটি বিল সংসদে পাস হয়েছিল। এ বছরে তা আরো সংস্কার করে ভূমি দখল বা অধিগ্রহণকে আরো নিরাপদ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৮] আগে রুটিনমাফিক জনসম্মতি এবং সামাজিক অভিঘাত সমীক্ষা যা কিছু বিধান রাখা হয়েছিল, সেগুলোও তুলে নেওয়া হয়েছে (রাজালক্ষ্মী, ২০১৫)। এ নিয়ে সারা ভারতজুড়েই একদিকে দখলদার বা অধিগ্রহণের সুবিধাভোগীদের উন্মাদনা, অন্যদিকে কৃষক গ্রামীণ মজুরদের আর্তনাদ, প্রতিবাদ, সংঘাত।[৯]

২০০৫ সালে গৃহীত সেজ (স্পেশিয়াল ইকোনমিক জোন) অ্যাক্টের মাধ্যমে বৃহদায়তন কৃষিজমি খুব কম খরচে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার আইনি ব্যবস্থা হয়। কর, শুল্ক ও বিধিমালা যতটা সম্ভব ছাড় দিয়ে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতের চেম্বার অব কমার্সের নেতৃবৃন্দ, আমলা, কনসালট্যান্ট– সবাই এখন এই বিষয়ে একমত। রাষ্ট্রের আইনি এবং একই সঙ্গে বল প্রয়োগে দ্বিধাহীন ভূমিকা এক্ষেত্রে নির্ধারক।

১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে 'জনস্বার্থ' বলতে সুনির্দিষ্টভাবে বাণিজ্যিক মুনাফামুখী তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এখন তাকেও জনস্বার্থ বলে দেখানো হচ্ছে। আগে যেখানে জমি অধিগ্রহণকালে সেখানকার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, সেখানে ২০১৪ সালের সংশোধিত 'ল্যান্ড বিল' অনুযায়ী, শিল্প খাত ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো, গৃহায়ণ ও প্রতিরক্ষা– এই পাঁচ খাতে কৃষকের সম্মতি ছাড়াই জমি অধিগ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে।[১০]

ভারতে পুঁজির বিকাশে বর্তমান পর্যায়ে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে জমি দখল প্রক্রিয়াকে আইনি বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। জমি নিয়ে দেশজুড়ে সংঘাতও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণের নামে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর হাতে জমি তুলে দেওয়ার নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ে গবেষণা করে মাইকেল লেভিন দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জমির দালালে পরিণত হয়েছে। কৃষকসহ গ্রামীণ মানুষদের উচ্ছেদ করে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিলাসবহুল হোটেল, গলফ মাঠ, ক্যাসিনো, বহুতল আবাসিক ভবন, সুপারমার্কেট তৈরির মহাযজ্ঞ চলছে। গ্রামীণ বেকারত্ব বাড়ছে, তবে গ্রামীণ ধনীদের জমির মূল্যবৃদ্ধিতে লাভ হচ্ছে, গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে (লেভিন, ২০১৫)।

ভূমির ওপর ভারতের বড় ব্যবসায়ীদের এই আগ্রাসন সীমান্ত অতিক্রম করতে ছটফট করছে। বাংলাদেশে দেশি বড় ব্যবসায়ী দখলদাররা ইতিমধ্যে নদী, বন, জমি দখলে অনেক এগিয়ে। দু'দেশেই এক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজি, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী, দেশি বৃহৎ ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, আমলা, কনসালট্যান্ট এবং সরকার– সবাই একাকার।

ভূমির ওপর ভারতের বড় ব্যবসায়ীদের এই আগ্রাসন সীমান্ত অতিক্রম করতে ছটফট করছে। বাংলাদেশে দেশি বড় ব্যবসায়ী দখলদাররা ইতিমধ্যে নদী, বন, জমি দখলে অনেক এগিয়ে। দু'দেশেই এক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজি, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী, দেশি বৃহৎ ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, আমলা, কনসালট্যান্ট এবং সরকার–সবাই একাকার।

সামরিক বাহু ও যুক্তরাষ্ট্র

১৯৭০-এর দশকেই যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই অঞ্চলের নেতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সম্প্রসারিত অঞ্চলের জন্য বিশ্বপুঁজির কেন্দ্র এখন ভারত, একই সাথে মার্কিন নিরাপত্তা কৌশলের আঞ্চলিক কেন্দ্রও তারা। পুঁজিমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক নতুন মোড় নেয় নব্বইয়ের দশক থেকে। ১৯৯৫ সালের বোঝাপড়ার সূত্র ধরে ২০০৫ সালের ২৮ জুন দু'দেশের মধ্যে 'নিউ ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য ইউএস-ইন্ডিয়া ডিফেন্স রিলেশনস' নামে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সাল পর্যন্ত দুই দেশ সামরিক ক্ষেত্রে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১১]

১৯৯৮-৯৯ সালে ভারতের ঘোষিত সামরিক বাজেট ছিল ৪৯ হাজার কোটি রুপি, ২০০৫-০৬ সাল নাগাদ তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয় ৯৭ হাজার কোটি রুপি। ২০১৩-১৪ সালের বাজেটে এটি আবারও দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়, এই বছরে দেখানো হয় দুই লাখ তিন হাজার ৬৭২ কোটি রুপি।[১২] ২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থাপন করা হয়। এখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রায় আড়াই লাখ রুপি (৪০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রস্তাব করা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৭ ভাগ। এছাড়া আর এক লাখের বেশি রুপি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৩] ভারত এখনো বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি অস্ত্র উৎপাদনে জোর দিয়েছেন। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী সংঘাত দু'দেশের শাসকদের জন্যই সুবিধাজনক। দেশে ভয়াবহ দারিদ্র্য রেখেও সামরিকীকরণ বিস্তারে এটি বরাবরই জুৎসই অজুহাত হিসেবে কাজ করে।

ভারত ও চীন: ঐক্য ও প্রতিযোগিতা

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ চীন ও ভারতের (ইন্ডিয়া) সমন্বিত অবস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখে যৌথভাবে এর নাম প্রস্তাব করেছেন চিন্ডিয়া (রমেশ, ২০০৭)। এ দুই দেশের সম্মিলিত জনসংখ্যা এখন ২৬০ কোটি, বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগের কাছাকাছি। চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। দুই দেশের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে বাণিজ্য বাড়ছে। ২০১৪-তে ৭০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৫-তে এর লক্ষ্যমাত্রা ১০০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেছেন দুই দেশের নেতৃবৃন্দ। ২০০৮ থেকেই চীন ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হয়েছে। ১৯৬২ সালে দুই দেশের মধ্যকার যুদ্ধ ও তার পরবর্তী যেসব বিষয় নিয়ে সংঘাত তৈরি হয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সিকিম নিয়ে বিরোধ। স্বাধীন রাষ্ট্র সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে অঙ্গীভূত করায় এই বিরোধের সূচনা হয়। ২০০৩ সালে এ বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়। জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে যৌথ ভূমিকা নেবার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ব্রিকসসহ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ে দুই দেশ একসাথেই

কাজ করছে।

১৯৯৯ সালে চীনের কুনমিং শহরে চীন, ভারত, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিদলের সভায় একটি উপ-আঞ্চলিক ফোরামের বিষয়ে ঐকমত্য হয়। ভৌগোলিকভাবে যেসব অঞ্চল এই ফোরামের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় সেগুলো হলো: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল আর তার সাথে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার। বিপুল খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলকে সংযুক্ত করলে পুরো অঞ্চল উন্নয়নে গতি পাবে– এই ধারণা নিয়েই অবকাঠামো ও যোগাযোগের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৩ পর্যন্ত এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন খুবই ধীরগতিসম্পন্ন ছিল। এ বছর চীন ও ভারত সরকারের উদ্যোগে কলকাতা থেকে কুওমিনটাং গাড়িযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগ নতুন গতি পায়।

এ বছরই ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রীরা বাকি দুটি দেশ, মানে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের (বিসিম) মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বছরই চার দেশের একটি যৌথ সমীক্ষা গ্রুপ গঠিত হয় এবং বছরের শেষে কুনমিংয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় (ভুথালিঙ্গম, ২০১৫)। এর আগে অবশ্য চীন তার অর্থনীতির বৈশ্বিক সম্প্রসারণে আরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল 'দ্য গ্রেটার মেকং সাবরিজিয়ন (জিএমএস) ইনিশিয়েটিভ', যাতে চীনের ইউনান প্রদেশের সঙ্গে তার পাঁচটি প্রতিবেশী দেশকে যুক্ত করে বড় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দেশগুলো হলো মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম।

অতি সম্প্রতি প্রাচীন সিল্ক রুটকে পুনর্বিন্যাস ও পুনরুজ্জীবনের বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে চীন। একটি পথ চীনকে মধ্য এশিয়া হয়ে ইতালির ভেনিস পর্যন্ত, যেখানে প্রাচীন চীনমুখী সিল্ক রুটের শুরু, এর সাথে যোগ হচ্ছে সামুদ্রিক সিল্ক রুট, যা ভেনিসের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর, আরব সমুদ্র এবং ভারত মহাসাগর হয়ে চীনের পূর্ব সমুদ্রপার যুক্ত করবে। এছাড়া চীন-পাকিস্তান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক করিডর শুরু হবে চীনের জিনজিয়াং থেকে কারাকোরাম হয়ে তা পাকিস্তানের গাদার গভীর সমুদ্রবন্দরে গিয়ে শেষ হবে। বেশ কয়েকটি তেল ও গ্যাস পাইপলাইন রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়া হয়ে চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়াকে যুক্ত করবে। একটি বহুমহাদেশীয় রেল যোগাযোগও চীন থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত নির্মিত হবে।

ভারত ও চীনের জন্য বাংলাদেশ

ভারত ও চীন উভয়ের পুঁজিমুখী প্রভাববলয়ের সম্প্রসারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাজার দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা আছে। আবার বোঝাপড়াও আছে। বাংলাদেশে এখন বৈধ বাণিজ্যে ভারত ও চীনের পণ্য আমদানি প্রায় সমান। অবৈধ বাণিজ্য হিসাব করলে ভারতের অবস্থান প্রায় দ্বিগুণ হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান এখন ওপরে হলেও প্রতিযোগিতা বাড়ছে। চীন ও ভারত উভয়ের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি তাদের উন্নয়ন রোডম্যাপের অন্তর্ভুক্ত। তবে ভারতের জন্য বাড়তি হলো, বাংলাদেশের ভূগোলেও তার নিয়ন্ত্রণ দরকার, এবং সেটা তার পক্ষে অনেকখানি সম্ভব বলেই ভারত সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যান্য বৃহৎ শক্তি, চীন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রকে সেক্ষেত্রে ভারতের সাথে সমঝোতায় এসেই নিজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ভারতকেন্দ্রিক আঞ্চলিক পরিকল্পনায় বহুজাতিক সংস্থাসমূহের তৎপরতা বৃদ্ধির কারণে ভারতের স্বার্থকে বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থ থেকে ভিন্ন করা কঠিন। সেজন্য চীন, যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতকেও অনেক সময় আলাদা করা যায় না। ভারতীয় পণ্য হিসেবে যাকে আমরা মনে করছি, তা হয়তো উৎপাদন করছে কোনো সুইডিশ কোম্পানি কিংবা যৌথ উদ্যোগ আছে কোনো কোরিয়ান, মার্কিন কোম্পানির সাথে, সে পণ্য আসছে বাংলাদেশে। মার্কিন কোম্পানি আউটসোর্সিং করছে ভারতে। কাজ দিচ্ছে ডাটা এন্ট্রি বা এ ধরনের। ভারত আবার অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোকে সাবকন্ট্রাক্ট দিচ্ছে বাংলাদেশের কোম্পানিকে। এ কারণে বাংলাদেশে এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, যেগুলো হয়তো মার্কিন বা ইউরোপীয় কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করছে, কিন্তু তা হচ্ছে ভারতের মাধ্যমে।

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা সাবকন্ট্রাক্ট কিংবা অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ইত্যাদি নানাভাবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, টেক্সটাইল, আইটি সেক্টর, কম্পিউটার, মোবাইল কোম্পানি, বিজ্ঞাপন শিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন, গণমাধ্যম, কনসালট্যান্সিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের লোকজনদের উপস্থিতি এখন আইনি-বেআইনি দু'ভাবেই অনেক বেড়েছে। ভারতের সংবাদ সংযোগে অনুসন্ধানী এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আছে পঞ্চম স্থানে। বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে আইনি ও বেআইনিভাবে পাঁচ লাখ ভারতীয় কাজ করেন। এঁরা বছরে ভারতে প্রেরণ করেন ৩৭১ কোটি ডলার বা প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।[১৪]

বৈশ্বিক সংস্থা, যেমন– বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কিংবা তাদের আশ্রিত বিভিন্ন থিংকট্যাংকই এখন বাংলাদেশের নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দেওয়া নীতি-কৌশল প্রধানত বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থেই প্রণীত, যার অন্যতম সুফলভোগী চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ভারতকেন্দ্রিক বৃহৎ পুঁজি। উদাহরণ হিসেবে অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে পাট শিল্প, জ্বালানি, টেলিকমিউনিকেশন, গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, শিক্ষা, চিকিৎসা অন্যতম।

বাংলাদেশের অধিকতর প্রান্তিকীরণ

বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশেই কয়েকটি প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে: সমাজ ও রাষ্ট্রের ধর্মীয়করণ, নদী-পানিসহ সর্বজনের সম্পদে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট আগ্রাসন, দখল, বাণিজ্যিকীকরণ এবং রাষ্ট্রের সামরিকীকরণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার জোরদার প্রতিনিধি। সীমানা ছাপিয়ে ভারতের বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার অর্থনীতিকে সাজানোর চাপ তাই বাড়ছে ক্রমেই। এই সম্প্রসারণে সবচাইতে অনুকূল উপাদান হলো বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে যেসব চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছে, তা এক দিনের বা এক সফরের বিষয় নয়। কয়েক দশকের ধারাবাহিকতায় এর মধ্য দিয়ে ভারতের অনেকগুলো দাবি/এজেন্ডা/পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ নিশ্চিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নৌপথ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ইন্টারনেট, জ্বালানি, অর্থকরী খাত বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আরো বেড়েছে। সামরিক ও প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থাও যে এর অন্তর্ভুক্ত তা ধারণা করা যায়।[১৫]

আগেই বলেছি, নরেন্দ্র মোদির এবারের সফরে ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হলো ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগের করিডর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। 'কানেক্টিভিটি' বা সংযুক্ততা নামে ট্রানজিট বা করিডর বিষয়ক যোগাযোগের এই রূপরেখা নিয়ে আলোচনা আজকের নয়। গত দুই দশক ধরে এসক্যাপ-এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্ববাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বৈশ্বিক যোগাযোগ বিস্তৃত ও অবাধ করার তাড়না থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এসব বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা-গবেষণা-প্রস্তাবনা আমরা দেখছি বহু বছর।

পুরো 'কানেক্টিভিটি' চুক্তিমালায় বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগ তুলনায় সামান্যই। বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতা, আসাম, শিলিগুড়ি বা মিয়ানমারের জনপরিবহন, পণ্য পরিবহনসহ যোগাযোগ তো ইতিমধ্যেই আছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ ও পণ্য পরিবহনে তাই নতুন কিছু যোগ করার নেই এখানে। অনেক পুরনো বিষয় নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা, যোগাযোগ বাড়ানো। কয়েক বছর আগে ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে সমঝোতা হলেও নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড পার হবার পাকা বন্দোবস্ত ভারত করেনি।

বস্তুত যা নতুন, এবং যা এই 'কানেক্টিভিটির' প্রধান দিক, এবং যা নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে তা হলো, ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সরাসরি সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী যোগাযোগের ব্যবস্থা। এই যোগাযোগ ভারতের বৃহৎ পুঁজি এবং রাষ্ট্রের জন্য বহুকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে এই অঞ্চল থেকে বিপুল খনিজ সম্পদ আহরণ, বাজার বিস্তার এবং সর্বোপরি ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের নিরাপদ ব্যবস্থা অনেকখানি নিশ্চিত হবে। এটা পেয়ে গেলে ভারতের ওইসব অঞ্চলের জনবিন্যাস, স্থানিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক বিন্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। ভারতের এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ খরচ ও সময় আগের তুলনায় শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগে নেমে আসবে।[১৬] সুতরাং এটা ভারতের জন্য, বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর জন্য একটি বড় ঘটনা। মূলধন সংবর্ধনে এটি এক বড় উল্লম্ফন ঘটাবে।

এই যোগাযোগ ভারতের বৃহৎ পুঁজি এবং রাষ্ট্রের জন্য বহুকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে এই অঞ্চল থেকে বিপুল খনিজ সম্পদ আহরণ, বাজার বিস্তার এবং সর্বোপরি ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের নিরাপদ ব্যবস্থা অনেকখানি নিশ্চিত হবে। এটা পেয়ে গেলে ভারতের ওইসব অঞ্চলের জনবিন্যাস, স্থানিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক বিন্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

কিন্তু এতে বাংলাদেশের ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি, না লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি, তা দেশবাসীর সামনে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করার কোনো প্রয়োজনই সরকার বোধ করেনি। শুধু আমরা শুনতে থাকি, এতে বাংলাদেশের বিপুল লাভ, কানেক্টিভিটি বাড়বে, ট্রাকের চালকরা খাবার কিনবে, যাত্রীরা থাকবে-ঘুরবে, আমাদের রাস্তা-বন্দর কত কত ব্যবহারের সুযোগ পাবে, এতে অবকাঠামোর উন্নতি হবে ইত্যাদি! এগুলো সবই 'বাইপ্রোডাক্ট'। ভারত দুই বিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে তাদের কর্তৃত্বে, তাদের জিনিসপত্র কিনে, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশের রেল ও সড়কপথ, বন্দর উন্নয়নের জন্য। একেই বাংলাদেশের বিরাট অর্জন হিসেবে বলেন অনেকে!

কিন্তু অবকাঠামোর নতুন বিস্তার করতে কতটা কৃষিজমি, জলাশয়, অরণ্য যাবে, সেটার হিসাব জনগণের জানা নেই। কিন্তু সবকিছুর জন্য তাদেরকেই বিভিন্নভাবে ভুগতে হবে। এর বিনিময়ে কী পরিমাণ শুল্ক পাওয়া যাবে, সেই ন্যূনতম বিষয়ও এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। এর আগে মানবিক কারণের কথা বলে ভারতীয় পণ্য চলাচল হয়েছে বিনা শুল্কে। তিতাস নদী আড়াআড়ি ভরাট করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি গেছে। এ রকম নানা অজুহাত আরো হয়তো তৈরি হবে ভবিষ্যতে।

অনেকে এ ধরনের যোগাযোগকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রথমত, এই যোগাযোগ ভারত থেকে ভারতে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে এ রকম কোনো ঘটনা নেই, যেখানে এক দেশ দ্বিতীয় আরেক দেশের মধ্য দিয়ে নিজ দেশেই আবার যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের প্রতিটি দেশের সঙ্গে প্রতিটি দেশের স্বার্থ স্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত। সকল সিদ্ধান্ত ও চুক্তি বহুল আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে গৃহীত। এখানে তার কোনো লক্ষণ নেই। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের তুলনায় ভারত যে ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করে, যে ভারসাম্যহীন ক্ষমতার সম্পর্ক, সে রকম অবস্থা কোনো দু'দেশের মধ্যে সেখানে নেই। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যা ঘটছে তা আসলে একমাত্র কিছুটা তুলনীয় হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়ে চারদিকে ঘেরাও থাকা দেশ লেসোথোর সঙ্গে। তার অভিজ্ঞতা তিক্ত।

কানেক্টিভিটির কথা বললেও বাংলাদেশকে তিন দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ডিসকানেক্ট করে রেখেছে ভারত। শুধু তা-ই নয়, 'কানেক্টিভিটির' এই কালে অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীগুলোর অবাধ পানিপ্রবাহকেও ডিসকানেক্ট করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নদীর পানি মানবিকতার বা দয়াদাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, আন্তর্জাতিক আইনস্বীকৃত অধিকার, যা থেকে দশকের পর দশক বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে ভারত। কাঁটাতারের পেছনে বড় যুক্তি, বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসী-জঙ্গির 'অবাধ চলাচল' ঠেকানো। বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের থেকে ভারতকে নিরাপদ করাই যদি কাঁটাতারের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই সন্ত্রাসের ভূমি দেশের মধ্য দিয়ে ভারতের পণ্য ও যাত্রীবাহী যান চলাচল কিভাবে নিরাপদ হবে? কে নিশ্চয়তা দেবে? এই কাঁটাতার রেখে, নদী আটকে রেখে বন্ধুত্ব আর কানেক্টিভিটি কিভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্নের সুরাহা হয়নি। কিংবা এই 'বন্ধুত্ব' আর অধঃস্তনতার তফাত কী, সে প্রশ্নেরও ফয়সালা হয়নি।

বাংলাদেশে ভারত থেকে গরু, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, চিনি, সার, কীটনাশক, ফেনসিডিল, কাপড়, প্রসাধনী, সিডি, রং, ওষুধ–প্রায় সবকিছুই আসে, বৈধ ও চোরাচালানি দুই পথেই। বাস, ট্রাক, গাড়ি, অটোরিকশা, টায়ার-টিউব, যন্ত্রপাতি তো আছেই। বাংলাদেশ থেকে তেলসহ আমদানীকৃত অনেক পণ্যই চোরাচালানির মাধ্যমে ভারতে যায়। আশির দশকে ভারতে ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। সে সময় বাংলাদেশ থেকে ক্যাসেট প্লেয়ার, রেডিও ইত্যাদি ধরনের অনেক পণ্য ভারতে চালান হতো। এখন এগুলো কম। চোরাপথে আরো যায় ইট, তৈরি পোশাক, ওষুধ, সার, চাল। নারী ও শিশু পাচারও চোরাই বাণিজ্যের অন্যতম দিক।

বলা হচ্ছে, কানেক্টিভিটির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। আকার, আয়তন ও ক্ষমতা– সব দিক থেকেই অনেক বড় অর্থনীতির দেশের

সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি থাকতেই পারে। সমস্যাটা বাণিজ্য ঘাটতির নয়, সমস্যা ভারসাম্যহীন প্রবেশাধিকারের। বাংলাদেশে ভারত আইনি ও বেআইনি পথে সব ধরনের পণ্য নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ভারতের বাজারে বাংলাদেশ যেসব পণ্য নিয়ে যেতে সক্ষম, সেগুলোর প্রবেশে নানা রকম শুল্ক-অশুল্ক বাধা তৈরি করে রাখা হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা না থাকলে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে রফতানি বর্তমানের দ্বিগুণ করা সম্ভব হতো।

একটি বিষয় ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছে যে, বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ যত বাড়বে, ভারতের বৃহৎ পুঁজি বাংলাদেশে যত রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন করবে, তত ভারতে রপ্তানির পথে বাধা কমবে, তার আগে নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সঙ্গে এই পরিস্থিতি তুলনীয়। মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু সেসব পণ্য উৎপাদন করছে যুক্তরাষ্ট্রেরই বৃহৎ কোম্পানিগুলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বাংলাদেশের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা ক্রমে ভারতীয় পুঁজির জুনিয়র পার্টনার বা কনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবেই নিজেদের সাজিয়ে নিচ্ছেন, সেভাবেই তাঁরা সন্তুষ্ট। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বের ভূমিকা ও তাদের কথাবার্তা থেকে তা-ই মনে হয়। উল্লেখ্য যে, এখন বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি ভারতের পণ্যের (টাটা-নিটোল) ডিলার হিসেবেই প্রধানত পরিচিত।

বর্তমান গতি বলছে, বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নৌপথসহ বাণিজ্য ও অর্থনীতির বিষয়ে বাংলাদেশকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব আরো বৃদ্ধির ক্ষেত্র এখন জোরদার হয়েছে। এটি এখন যত নিশ্চিত ও স্থিতিশীল, ততটা ইতিহাসের কোনো সময়েই ছিল না। কারণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষই নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার জন্য ভারতের শাসকশ্রেণির সিদ্ধান্তকেই নির্ধারক মনে করছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকেন্দ্রিক আঞ্চলিক কৌশল আরো স্পষ্ট রূপ নেওয়ায় এটি এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তার ফলে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থে সার্বভৌমত্ব ও জনস্বার্থ ভারতের পক্ষে সমর্পণ করায় রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে দুই পক্ষ। এর ফলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো প্রান্তিকীকৃত হচ্ছে।

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য ভারতের সমর্থন দরকার। আবার কারো কারো মতে, ভারতের আধিপত্য দূর করতে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে হবে। দুটো ধারণাই বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতি ও ব্যাকরণ সম্পর্কে খণ্ডিত বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত।

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য ভারতের সমর্থন দরকার। আবার কারো কারো মতে, ভারতের আধিপত্য দূর করতে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে হবে। দুটো ধারণাই বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতি ও ব্যাকরণ সম্পর্কে খণ্ডিত বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশে জল, জমি, জঙ্গল, বাজার দখলে পুঁজির আগ্রাসনে তিন দেশই নানাভাবে সক্রিয়, এখানে দেশ ভাগ করা কঠিন। তিন দেশের পুঁজিতেই তিন দেশের যুক্ততা আছে। সামরিক বা কৌশলগত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের মধ্যে কিছু কিছু বিরোধ থাকলেও তা সাময়িক, এবং খুব দ্রুত নিরসনের সম্ভাবনা বেশি। এই তিনটি দেশই বিশ্বের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। তারা কেউ বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্য দেশের সাথে বিরোধে জড়াবে না। তাদের ঐক্য ও লড়াই দুটোই বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হুমকি হতে পারে। আরেকজনের ওপর ভর করে বাংলাদেশ বাঁচবে না। বাংলাদেশের সমস্যা এর অভ্যন্তরে, শাসকশ্রেণির গঠনে, তার রাজনীতি ও উন্নয়ন দর্শনে, সর্বোপরি দাসত্বের সংস্কৃতিতে, যা দ্রুতই অস্তিত্বের সংকট তৈরি করতে পারে। ভরসা কেবল আমাদের পাল্টা ইতিহাসে, জনবিদ্রোহের অসংখ্য অভিজ্ঞতায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রবল সাহসে।

দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের পাল্টা কানেক্টিভিটি

দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন এই অঞ্চলের মানুষকে একটি যৌক্তিক রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক বৃহত্তর কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত। ভারত যদি কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকত, তাহলে হয়তো এর জন্য অনুকূল অবস্থা তৈরি হতো বেশি। কিন্তু সেই সম্ভাবনা নেই। তাহলে উপায় কী? উপায় তৈরি হবে পাল্টা ঐক্য, সংহতি ও লড়াইয়ের মধ্যে।

অভিন্ন নদী, বিশাল পানিসম্পদ, কৃষি, খনিজ সম্পদ ও মানবসম্পদ নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলে জনস্বার্থে সহযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণের মতো রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি হলে পুরো অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, অসম্মান, বৈষম্য ও নিপীড়নের বর্তমান অমানবিক অবস্থা থেকে বের হওয়া সম্ভব। কিন্তু কর্পোরেট স্বার্থ, আঞ্চলিক আধিপত্য ও বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের এসব অভিন্ন স্বার্থকে খর্ব করছে।

এখনকার 'কানেক্টিভিটি' ভারতের বৃহৎ পুঁজির ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা মেটানোর জন্যই পরিকল্পিত। ভারতের অভিজ্ঞতা বলে, সেখানে বিদ্যমান উন্নয়ন মডেল দারিদ্র্য, সহিংসতা, যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর বৈষম্যের জগদ্দল পাথর থেকে জনগণকে মুক্ত করতে পারেনি। তাদের লড়াই অব্যাহত আছে নানা মাত্রায়। ভারতের মিডিয়ায় বলিউড জাঁকজমক যত প্রচারিত, এসব প্রতিরোধের খবর ততই ধামাচাপা দেওয়া। বাংলাদেশের মানুষের ক্ষোভ ও স্বপ্ন, জীবন ও লড়াইয়ের খবরও ভারতে অজানা। এই দুইয়ের কানেক্টিভিটি বা যুক্ততাই কেবল এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কাঁটাতার ডিঙিয়ে অভিন্ন স্বার্থের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, দক্ষিণ এশিয়ায় মানবিক বিন্যাসের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে পানি আর বন, জমি আর জনজীবন মুনাফার সন্ধানে পুঁজির নির্বিচার ও অধিকতর আগ্রাসনের মুখে। উন্নয়ন নামের এই ধ্বংসলীলাই দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের সংহতি প্রতিষ্ঠার একটি অভিন্ন জমিন হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন আগে কলকাতায় দেওয়া এক বক্তৃতায় আমি যে প্রস্তাব রেখেছিলাম, তা এখানে পুনর্ব্যক্ত করে এই লেখা শেষ করতে চাই।[১৭] জনপন্থী রাজনীতি, বিদ্যাচর্চা এবং সব মুক্ত মানুষের মধ্য থেকে এই বিষয়ে চিন্তা ও সক্রিয়তা অপরিহার্য। যৌথ চিন্তা ও সক্রিয়তার প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলো হলো:

প্রথমত, মুক্ত বিশ্বের রূপকল্পের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে মুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার রূপকল্প দাঁড় করানো এবং তা মানুষের চিন্তার মধ্যে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার সকল সম্পদ, বিশেষত খনিজ সম্পদ ও পানিসম্পদ যাতে সকল মানুষের কাজে সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হয়, সেজন্য আঞ্চলিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা নকশা তৈরির কাজ। এটা হবে বিশ্বব্যাংক-ইউএসএইড ও দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক

গোষ্ঠীর মুনাফামুখী উন্নয়ন কৌশলের পাল্টা নকশা।

তৃতীয়ত, সকল নদী ও পানিপ্রবাহ নিয়ে, সকলের অধিকারে স্বীকৃতি দিয়ে, সমন্বিত চিন্তা ও পরিকল্পনা মূর্ত করা।

চতুর্থত, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, শ্রেণি-লিঙ্গ-জাতি-বর্ণগত নিপীড়ন ও বৈষম্যবিরোধী আমাদের চিন্তা ও লড়াইকে পরস্পরের কাছে পরিষ্কার রাখা এবং সমন্বয় করা। এবং

পঞ্চমত, বাংলাদেশে সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প এবং ভারতে আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনাসহ দু'দেশের যেসব 'উন্নয়ন' প্রকল্প মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ধ্বংসাত্মক সেগুলোর বিরুদ্ধে চিন্তা ও প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এর মধ্য দিয়ে উন্নয়নের নতুন গতিপথ স্পষ্ট করা।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

পাদটীকা

১. এই ঘোষণায় যেসব চুক্তি ও সমঝোতার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো: Bilateral Trade Agreement (renewal), Agreement on Coastal Shipping between Bangladesh and India, Protocol on Inland Water Transit and Trade (renewal), Bilateral Cooperation Agreement between Bangladesh Standards &Testing Institution (BSTI) and Bureau of Indian Standards (BIS) on Cooperation in the field of Standardization, Agreement on Dhaka-Shillong-Guwahati Bus Service and its Protocol, Agreement on Kolkata-Dhaka-Agartala Bus Service and its Protocol, Memorandum of Understanding between Coast Guards, Memorandum of Understanding on Prevention of Human Trafficking, Memorandum of Understanding on Prevention of Smuggling and Circulation of Fake Currency Notes, Memorandum of Understanding between Bangladesh and India for Extending a New Line of Credit (LoC) of US$ 2 billion by Government of India to Government of Bangladesh, Memorandum of Understanding on Blue Economy and Maritime Cooperation in the Bay of Bengal and the Indian Ocean, Memorandum of Understanding on Use of Chittagong and MonglaPorts, Memorandum of Understanding for a Project under IECC (India Endowment for Climate Change) of SAARC, Memorandum of Understanding on Indian Economic Zone, Statement of Intent on Bangladesh-India Education Cooperation (adoption), Agreement between Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) and Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for leasing of international bandwidth for internet at Akhaura, Memorandum of Understanding between University of Dhaka,Bangladeshand Council of Scientific and Industrial Research, India for Joint Research on Oceanography of the Bay of Bengal, Handing over ofConsent Letter by Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA), Bangladesh to Life Insurance Corporation (LIC), India to start operations in Bangladesh, http://www.thedailystar.net/online/bangladesh-india-joint-declaration-93490

২. মঈদুল হাসানের 'মূলধারা ৭১' এই বিষয়ে জানার জন্য সবচাইতে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' গ্রন্থটিও অনেক অজানা বিষয় স্পষ্ট করে।

৩. তার প্রামাণ্য বিবরণ নিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' এর অন্যতম।

৪. ওই বছর যুদ্ধাপরাধী বিচার আন্দোলনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী নেতৃত্বাধীন দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় তারা ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়, এবং মাঠে আবারও আবির্ভূত হয়। সে সময় নির্মূল কমিটির সভা-সমাবেশ-মিছিলে আমাদের একটি স্লোগান ছিল 'গোলাম আযম আদভানি, দুই দেশের দুই খুনি'। উল্লেখ্য যে, বিজেপি নেতা এই আদভানি ছিলেন বাবরি মসজিদ ভাঙার অভিযানের নেতা।

৫. দুটো আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হলো ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইন, যা এখন আরো জোরদারভাবে ব্যবহৃত হয়: Armed Forces (Special Power) Act 1942. এবং দ্বিতীয়ত, TADA [Terrorist and Disruptive Activities (prevention) Act].

৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশধারা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান নিয়ে বেশ কয়েকটি বক্তৃতায় আমার ব্যাখ্যা, পর্যবেক্ষণ পাওয়া যাবে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে (মুহাম্মদ, ২০১৪)।

৭. ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ার উদ্ভব ও ধরন নিয়ে (ঘোষ, ১৯৮৫) গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থ নিয়ে পার্থ চ্যাটার্জির পর্যালোচনাও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে, যেটি পরে নিম্নোক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয় (চ্যাটার্জি, ১৯৯৭)।

৮. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill 2015.

৯. সর্বভারতীয় বন-শ্রমজীবী জনতা থেকে জানানো হয়েছে, গত ১২ জুন ২০১৫ উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাদের একটি বড় সমাবেশ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় 'ভূমি অধিকার আন্দোলন', 'সর্বভারতীয় জনমঞ্চ', বাম দলের সাথে সম্পর্কিত ও স্বাধীন শ্রমিক-কৃষক সংগঠনসহ আরো বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০১৫ দিনব্যাপী ধরনা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে। এটা হবে যেখানে এর আগে কানহার বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়েছিল এবং পুলিশের গুলিতে সাংবাদিক ও

আদিবাসী নিহত হয়েছিলেন।

১০. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে আরো আলোচনার জন্য দেখুন এই সংকলনভুক্ত মাহা মির্জার লেখা।

১১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য The Research Unit for Political Economy, 2005. `Aspects of India's Economy'. Mumbai. December.

১২. 'Aspect' পূর্বোক্ত ১১ নং এ। এবং http://www.idsa.in/idsacomments/IndiasDefenceBudget2013-14_lkbehera_040313
১ ৩ . http://www.idsa.in/issuebrief/IndiasDefenceBudget2015-16_lkbehera_020315.html

১৪. ভারতের প্রবাসী আয় এবং এর উৎসসমূহ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেখুন: http://www.siliconindia.com/news/business/15-Nations-Sending-Highest-Remittances-to-India-nid-147515-cid-3.html)

১৫. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরের সপ্তাহে সেখানকার সেনাবাহিনীর প্রধান বাংলাদেশ সফর করেন। চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে তিনি বার্ষিক (পাসিং আউট) প্যারেডে সালাম নেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ, অঞ্চলে চীনের কৌশলগত তৎপরতার' উল্লেখ করে আরো বলা হয়: *'ভারতের সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ, মহড়া, সামরিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সরবরাহসহ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সক্ষমতা নির্মাণের ('build capacity') জন্য কাজ করছে।'*
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Army-chief in-Bangladesh-to-bolster-military cooperation/articleshow/47684390.cms

১৬. একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে–(১) নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় ২০ ফুট একটি কনটেইনার সমুদ্রপথে নিয়ে যেতে (মুম্বাই, সিঙ্গাপুর অথবা কলম্বো হয়ে চট্টগ্রাম এবং পরে ট্রেনে ঢাকা) সময় লাগে ৩০ থেকে ৪০ দিন এবং খরচ লাগে ২৫০০ মার্কিন ডলার। এটি যদি সরাসরি দিল্লি থেকে ট্রেনে পরিবহন করা হয়, সময় লাগবে চার-পাঁচ দিন, খরচ হবে তিন ভাগের এক ভাগ, ৮৫০ মার্কিন ডলার। (২) ভারতের পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে পণ্য পরিবহনে ট্রেন সীমিত থাকায় তা মুম্বাই-করাচি হয়ে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার ঘুরে যায়। সড়কপথে গেলে দূরত্ব হবে ৩০০ কিলোমিটার। (৩) ভারতের অনুমতি না থাকায় ঢাকা থেকে লাহোরে পণ্য পরিবহন স্থলপথে না করে করতে হয় মুম্বাই-করাচি হয়ে সমুদ্রপথে, তাতে দূরত্ব ২৩০০ কিলোমিটার থেকে প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ৭১৬২ কিলোমিটার। (৪) বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহন করলে আগরতলা থেকে কলকাতা বা আসাম থেকে কলকাতা দূরত্ব যথাক্রমে ছয় ভাগের এক ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ দাঁড়াবে (খারেল, ২০০৯)।

১৭. মুহাম্মদ,আনু (২০১৪খ), "দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম স্মারক বক্তৃতা", ভারত সভা হল, কলকাতা, ৪ এপ্রিল।

তথ্যসূত্র:

খারেল, ২০০৯] Kharel, P (2009), *Case for South Asian Transit Arrangement.* Brifieng Paper No 11, Kathmandu: SAWTEE.

[ঘোষ, ১৯৮৫] Ghosh, Suniti Kumar (1985), *The Indian Big Bourgeoisie,* Calcutta: Subarnarekha.

[ঘোষ, ২০১৫] Ghosh, Jayati (2015), "Agriculture in Crisis", *The Frontline*, April 17.

[চ্যাটার্জি, ১৯৯৭] Chatterjee, Partha (1997), *A Possible India,* New Delhi: OUP.

[চৌধুরী, ২০১৫] Choudhury, Upendra (2015), "India and China as Rising Powers: Collision or Cooperation?", *Southasiajournal*, Mar 25.

[নিগম, ২০১৫] Nigam, Shalu (2015), "Revisiting Hunger in South Asia", March 25.

[পাটনায়েক, ২০১৩] Patnaik, Utsa (2013), "Poverty Trends in India 2004-05 to 2009-10", *Economic & Political Weekly,* October 5.

[পাটনায়েক, ২০০৫] Patnaik, Utsa (2005), "It is time for Kumbhakarna to wake up", *The Hindu.*

[ফ্রন্টলাইন, ২০১৪] Frontline (2014), "How India lives", February 5, based on the 69th round of the National Sample Survey Office (NSSO) in its nationwide survey on "Drinking water, sanitation, hygiene, and housing condition in India" conducted from July to December 2012, covering 4,475 villages and 3,522 urban blocks.

[ভুথালিঙ্গম, ২০১৫] Bhoothalingam, Ravi (2015), "Can the Chinese Connection Speed India's Development?", *Economic & Political Weekly,* May 9, vol.34, no. 19.

মুহাম্মদ, আনু (২০১৪), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (২০১৪খ), "দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম স্মারক বক্তৃতা", ভারত সভা হল, কলকাতা, ৪ এপ্রিল।

[রমেশ, ২০০৭] Ramesh, Jairam (2007), *Making Sense of Chindia: Reflections on China & India, Delhi.*

[রায়, ২০০৮] Roy, Arundhati (2008), *The Shape of the Beast,* New Delhi: Penguin.

[রায়, ২০১২] Roy, Arundhati (2012), "Capitalism A Ghost Story", *The Outlook,* 26 March.

[রাজালক্ষ্মী, ২০১৫] Rajalakshmi, T.K. (2015), "The Ideas of March", *The Frontline*, May 15.

[লেভিন, ২০১৫] Levien, Michael (2015), "From Primitive Accumulation to Regimes of Dispossession: Six Theses on India's Land Question", March 17, Johns Hopkins University.

[সিপরি, ২০১৪] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2014), http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/AT_march_2014